● ৮.২.৭.১ : তেভাগার কৃষক-আন্দোলন

♦ **পটভূমি** : ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা 'ফ্লাউড কমিশনে'র সুপারিশ কার্যকর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। এই কমিশন উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষীকে প্রদান করার সুপারিশ করেছিল। কৃষক সভা জোতদারদের জমিতে কর্মরত ভাগচাষি ও বর্গাদারকে উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ফসল কাটার সময় দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিং, রংপুর, মালদা, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হলে কৃষকরা সমবেতভাবে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। "তেভাগার দাবিতে সংগ্রামী কৃষকদের পদভারে জোতদার-জমিদারদের বুকে কাঁপন জাগে।" ১৯৪৭ সালের ১৯শে মার্চ তেভাগা আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কলকাতার **'স্টেটস্‌ম্যান'** পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছিলেন :

> বিগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে (কৃষক) ছিল নিশ্চুপ; আজ এক শ্লোগানের আওয়াজে সে হয়েছে মুখর। সাথীদের সঙ্গে নিয়ে তারা মাঠ ভেঙে চলে, সবার কাঁধের ওপর রাইফেলের মতো ক'রে ধরা লাঠি মিছিলের সামনে তাদের লালঝাণ্ডা — দেখে অনুপ্রেরণা জাগে। গ্রামের নিঝুম ঝোপঝাড়ের পাশে নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের কাছে তুলে তারা যখন সহযোগী সাথীদের 'ইনকিলাব, কমরেড' বলে সম্বোধন করে, তা' শুনে বুকের ভেতরটা যেন গুরু গুরু করে।... হিংসার ঘোর বিরোধী তারা, তবে প্রয়োজন হলে ঐ লাঠি তাঁরা ব্যবহার করবেন না, তাও নয়।

♦ **আন্দোলনের প্রকৃতি** : ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে জোতদারদের জমিতে কর্মরত ভাগচাষি ও বর্গাদারদের উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ প্রদানের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। নভেম্বর মাসে ফসল কাটার সময় বাংলার ২৫টি জেলাতেই ঐ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক ঐ ঐতিহাসিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কয়েকটি দিক থেকে তেভাগা আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

প্রথমত, এই আন্দোলন ছিল মূলত অর্থনৈতিক সংগ্রাম; শ্রেণী-সংগ্রাম নয়। তাই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করার লক্ষ্য নিয়ে তা পরিচালিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবে এই আন্দোলন কৃষি-বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত না হওয়ায় কৃষকদের এই সংগ্রামকে সমর্থন করার বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে আসেনি। অথচ যে-কোনো কৃষি-বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব একান্তভাবেই প্রয়োজন। ফলে এই আন্দোলন সঠিক পথে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারেনি।

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, এই আন্দোলন সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারী নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কারণ, জোতদার, জমিদারদের সঙ্গে ধনী কৃষককেও আন্দোলনকারীরা শত্রু বলে মনে করত। ফলে শেষ পর্যন্ত ধনী কৃষকরা তো বটেই, এমনকী মাঝারি কৃষকরাও পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

চতুর্থত, কৃষকসভা অনেক রাজনৈতিক শ্লোগান দিলেও তেভাগা আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার আদৌ চেষ্টা করেনি। ফলে তা দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পঞ্চমত, তেভাগা আন্দোলন জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ বেড়াজালে যে আটকে পড়েনি, তার প্রমাণ হোল — যেখানে ঐ আন্দোলন হয়েছে, সেখানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেনি।

♦ **ব্যর্থতার কারণ** : ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা যে-তেভাগা আন্দোলন শুরু করেছিল, নানা কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইসব কারণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল :

(১) সংগ্রামী ভাগচাষি এবং ক্ষেতমজুরদের এই রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে, গ্রামাঞ্চল থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূলোচ্ছেদ ক'রেই কেবল কৃষকশ্রেণীর পূর্ণ মুক্তি সম্ভব। এই রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবই তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়।

(২) কৃষকদের এই সংগ্রামকে সমর্থন করার বা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে আসেনি। ফলে সাংগঠনিক এবং অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্যভাবে দেখা দেওয়ায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরূপতাকে তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে ধনাগারে, কুপার প্রমুখ চিহ্নিত করেছেন।

(৪) আবদুল্লা রসুলের মতে, এই আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে কৃষকদের শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে সংস্কারবাদী ধারণার আধিক্য এবং আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থার অভাবের জন্যই তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

(৫) বদরুদ্দিন উমর বলেছেন যে, কৃষক সভা অনেক রাজনৈতিক শ্লোগান দিলেও তেভাগা আন্দোলনকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার আদৌ কোনো চেষ্টা করেনি। ফলে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতে না পারায় অতি সহজেই সরকারী আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

(৬) যে-কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠন হিসেবে কৃষক সভা ঐ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, ঐ সময় সেই কমিউনিস্ট পার্টিরই নিজস্ব কোনো কর্মসূচী ছিল না। ফলে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশলের অভাবে ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

(৭) তাছাড়া, বাংলার মুসলিম লীগ সরকার সীমাহীন দমন-পীড়নের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। প্রাদেশিক কৃষক সভার রিপোর্ট অনুযায়ী তেভাগা ও অন্যান্য দাবিতে কৃষক-আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে কেবল চবিবশ পরগণা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও

Scanned with CamScanner

ময়মনসিং জেলায় ৩,১১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় ৭০ জন কৃষক পুলিশ ও জোতদারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। হাজার হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এমনকি, কৃষক-রমণীরাও পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় জ্যোতি বসু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, কৃষকদের আত্মবলিদান কখনই ব্যর্থ হবে না।

Scanned with CamScanner